২৯ ভারত সরকার ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতি—১৯৬৮

ভারত স্বাধীন হবার পর দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে যে সব ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে 'শিক্ষা' অন্যতম। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৬৪ খ্রীঃ-এর মধ্যে তিনটি শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণন, মুদালিয়র, কোঠারী) বসান হয়। রাজ্যস্তরেও বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করে ও শিক্ষার উন্নয়নে বহু সুপারিশ করে রিপোর্ট পেশ করে। এই সব সুপারিশের সামান্য অংশই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। সর্বভারতীয় কোন ঘোষিত শিক্ষা নীতি না থাকার ফলে রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষার কাঠামোগত পাঠক্রম ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দেয়। ১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বের হবার আগে পর্যন্ত ভারত সরকার শিক্ষা সম্পর্কে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে কোন সুসংবদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেননি। কোঠারী কমিশনের সুপারিশ সমূহ প্রকাশ হবার পর এ সুপারিশ সমূহ নিয়ে দেশব্যাপী আলাপ আলোচনা শুরু হয়। বহু আলোচনা ও বিতর্কের পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের উদ্যোগে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি স্থির হয়। ১৯৬৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৬৮ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় সরকার ঐ নীতিসমূহ অনুমোদন করার পর যথারীতি সমগ্র ভারতের জন্য 'জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮' ঘোষিত হয়। মোট ১৭টি ধারা সম্বলিত এই শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত ভারতের শিক্ষার রীতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হয়।

১৯৬৮ খ্রীঃ শিক্ষানীতি

ঘোষিত শিক্ষানীতির প্রারম্ভে বলা হয় ভারতীয় সমাজ চিরদিনই শিক্ষাকে একটা বিশেষ মর্যাদার স্থান দিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে জাতীয় নেতারা ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের শিক্ষার কথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার আগেই গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় উন্নয়ন ও নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার সে সম্পর্কে সরকার বিশেষ সচেতন ছিলেন। এজন্য একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)। এই সব কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে বিজ্ঞান নীতি গৃহীত হলে বিজ্ঞান ও গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) গঠনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্তরে শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে সে সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বের হবার পর এ নিয়ে আলোচনা হয় এবং জনসাধারণও জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে একমত হয়।

কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক সংস্কারের প্রয়োজন, এই ধারণায় সরকারের মনও দৃঢ় হয়। শিক্ষামানের সার্বিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া, শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত

করা ও শিক্ষাকে জীবনমুখী করা এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উন্নতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন। শিক্ষা হবে জাতীয় উন্নতির, জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করবার পক্ষে সহায়ক। ভারত যাতে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে সেজন্যই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

এই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয় তা শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) সুপারিশ সমূহকে সামনে রেখেই করা হয়।

১। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রথম শর্ত হচ্ছে সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা। তাই ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রথমেই বলা হয়েছে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার কথা। সংবিধানের ৪৫নং ধারার নির্দেশ অনুসারে ১৪বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ের শিক্ষা অবিলম্বে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার জন্য চেষ্টা যথাসম্ভব চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে এই স্তরে শিক্ষার যে অপচয় ও অনুন্নয়ন আছে তা বন্ধ করতে উপযুক্ত কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর শিক্ষার্থী যেন নির্ধারিত পাঠক্রম শেষ করে তা দেখতে হবে।

২। শিক্ষকদের সম্মান, বেতন ও শিক্ষণ

জাতীয় শিক্ষার মান নির্ধারণে ও উন্নয়নে শিক্ষকের একটা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকখানিই নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, ব্যক্তিগত ও চারিত্রিক গুণাবলীর উপর। শিক্ষক যাতে সমাজে সম্মানজনক স্থান লাভ করেন, তার চাকুরীর শর্তাবলী যেন সন্তোষজনক হয়। শিক্ষকের বেতন ও চাকরীর শর্তাদি শিক্ষকের দায়িত্ব ও যোগ্যতার সাথে সংগতি পূর্ণ হতে হবে। শিক্ষকের স্বাধীনভাবে পড়াশুনা ও গবেষণার অধিকার থাকবে। গুরত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিষয়ের উপর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও লিখিত বিষয়গুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। চাকুরী করা কালীন শিক্ষক শিক্ষণের যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে।

৩। ভাষার উন্নয়ন

বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রে শিক্ষায় ভাষা একটি বিতর্কিত প্রশ্ন, ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির সাথে ভাষা অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণে ভাষার প্রশ্নে বলা হয়েছে—আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতি অপরিহার্য। ভাষার উন্নতি না হলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে না, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটবে না, সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটবে না। বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তার বিলোপসাধন হবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রচলিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে।

ত্রিভাষা সূত্র

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যাতে ত্রি ভাষা সূত্র বাস্তবে রূপায়িত হয় সে চেষ্টা চালাতে হবে। হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যে হিন্দী, ইংরেজী ও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয় একটি ভাষা হলে ভাল হয়) শিখতে হবে। অহিন্দী ভাষা ভাষী রাজ্যে থাকবে আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজী ও হিন্দী। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের হিন্দী ও ইংরেজী পাঠক্রম চালু করতে হবে।

হিন্দী

হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা রূপে হিন্দীকে এমনভাবে উন্নীত করতে হবে যাতে সংবিধানের ৩৫ নং ধারা অনুসারে এই ভাষা ভারতের মিশ্রসংস্কৃতির রূপটি প্রকাশের উপযোগী হয়। অহিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হবে।

সংস্কৃত

ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশে সংস্কৃতের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃত ভাষার অবদান অনস্বীকার্য। এই কথা মনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। সংস্কৃত শেখাবার নতুন পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ভারততত্ত্ব ও ভারতীয় দর্শন চর্চার সাথে সংস্কৃত চর্চার সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে হবে।

আন্তর্জাতিক ভাষা

ইংরেজী ও অন্য আন্তর্জাতিক ভাষার চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশ্বে জ্ঞানের ক্ষেত্র দ্রুত প্রসার লাভ করছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভাণ্ডার দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। ভারত শুধু বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করবে না, নতুন অবদানও যোগাবে। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষার চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৪। শিক্ষাগত সমান সুযোগ সুবিধা

(ক) শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আঞ্চলিক বৈষম্য আছে তা সংশোধন করতে হবে। গ্রাম ও অনগ্রসর অঞ্চলে শিক্ষাকে প্রসারিত করতে হবে।

(খ) সামাজিক বৈষম্য দূর করতে ও জাতীয় সংহতিকে সম্প্রসারিত করতে সাধারণ স্কুল (*Common School)* ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। *Public School*-এর মত স্কুলগুলিতে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করতে হবে। সামাজিক অসাম্য দূর করতে কিছু সংখ্যক দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে। সংবিধানে ৩০ নং ধারায় সংখ্যালঘুদের যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা ক্ষুন্ন করা চলবে না।

(গ) নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু সামাজিক ন্যায় বিচারের জনাই নয়, সামাজিক রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনেই এটা করতে হবে।

(ঘ) দৈহিক ও মানসিক দিকে থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সুবিধার প্রসার ঘটাতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুশিক্ষার্থীরা যাতে সাধারণ স্কুলে পড়তে পারে তার জন্য সমন্বিত এক কার্যসূচী রচনা করতে হবে।

(ঙ) অনগ্রসর শ্রেণী, বিশেষ করে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে আরো নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা চালাতে হবে।

৫। প্রতিভা চিহ্নিত করণ

যথা সম্ভব অল্প বয়সে প্রতিভাবান ছেলেদের খুঁজে বের করতে হবে এবং এইসব ছেলেদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে এদের উৎসাহিত করা হবে।

৬। কর্মে অভিজ্ঞতা ও জাতীয় সেবা

উপযুক্ত কার্যসূচীর মাধ্যমে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে সমাজসেবা ও জাতীয় পুনর্গঠনে অর্থপূর্ণ কর্মসূচী শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে এই কর্মসূচীতে স্বনির্ভরতা, চরিত্রগঠন ও সমাজসেবায় নিজেকে সঁপে দেবার মনোবৃত্তি গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

৭। বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা

জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির ধারাকে গতিশীল করতে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষার শেষ পর্যন্ত শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

৮। কৃষি ও শিল্পের জন্য শিক্ষা

(ক) কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য এই দুই শিক্ষার প্রতি আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য প্রতিটি রাজ্যে অন্তত একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। কৃষি বিষয়ক শিক্ষাই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান বিষয় হবে, তবে কৃষি বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(খ) কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষা হবে এই শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(গ) কৃষি শিল্প ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত মানবশক্তির সর্বদা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। মানবশক্তির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

৯। পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন

প্রতিভাবান লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে ভাল বই প্রকাশ করতে হবে। এবিষয়ে তাদের উৎসাহিত করতে, তাদের উদার হস্তে পারিশ্রমিক দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয় স্তরে উন্নতমানের বইয়ের প্রয়োজন। অবিলম্বে এই অভাব পূর্ণ করতে হবে। ঘনঘন বই বদলানো চলবে না জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কথা মনে রেখে বইয়ের দাম কম রাখতে হবে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্বশাসিত বুক কর্পোরেশন স্থাপন সম্ভব কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। সব ভারতের জন্য বই লেখার চেষ্টা করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় ছোটদের জন্য ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বই লেখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

১০। পরীক্ষা

পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দেখতে হবে পরীক্ষা হবে নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের একটি গুণের বিচারের পরিবর্তে তার দৈনন্দিন কাজের অবিরাম মূল্যায়নই হবে শিক্ষার্থীর সাফল্য ও উন্নয়নের বিচারের সঠিক মাধ্যম।

১১। মাধ্যমিক শিক্ষা

(ক) সামাজিক পরিবর্তন অনেকটা মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভরশীল। সমাজের যে সব শ্রেণীর কাছে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ নাই সেইসব অঞ্চলে অবিলম্বে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

(খ) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে চাকুরীর সুযোগ সুবিধার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা কর

হবে। কৃষি, কারিগরি, ব্যবসা বাণিজ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, কারুশিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা দেওয়া যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার একটা যোগসূত্র গড়ে তোলা দরকার।

১২। বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) কোন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কতটা আছে তা বিচার করে কোন বিভাগে কতজন ছাত্র ভর্তি করা হবে তা স্থির করতে হবে।

(খ) নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আগে কতকগুলি বিষয়ে সাবধানতা গ্রহণ করা দরকার। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও উপযুক্ত শিক্ষামান রক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবা যেতে পারে।

(গ) স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠক্রমের সংগঠন ও এই স্তরের গবেষণাগার ও শিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) উন্নত শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। শিক্ষণ ও গবেষণা যাতে সর্বোচ্চ মানের হয় সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার জন্য অধিক অর্থের বরাদ্দ করতে হবে। গবেষণাগারগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে গবেষণা সংস্থার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে।

১৩। আংশিক সময়ের ও ডাকযোগে শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আংশিক সময়ের শিক্ষা ও ডাকযোগে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কৃষি ও শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজের যে অংশ পূর্ণ সময়ের শিক্ষার সুযোগ পায় না এই ব্যবস্থা তাদের বহু উপকারে আসবে। এই শিক্ষাকে পূর্ণ সময়ের শিক্ষার সমমর্যাদা দিতে হবে।

১৪। সাক্ষরতার প্রসার ও বয়স্কদের শিক্ষা

(ক) কৃষির উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক মানসিকতার সৃষ্টির জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বড় বড় শিল্প সংস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যত শীঘ্র সম্ভব স্বাক্ষর করে দক্ষ কর্মী রূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে ছাত্র শিক্ষকদের এক হয়ে অভিমান শুরু করতে হবে।

(খ) তরুণ চাষীদের দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে তরুণদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

১৫। খেলাধুলা

ছাত্রদের দৈহিক সামর্থ বাড়াতে খেলাধুলার প্রসার ও উন্নতি ঘটাতে হবে। সারাদেশ ব্যাপী দৈহিক শিক্ষার ও খেলাধুলার উন্নতির কার্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। যেখানে খেলাধুলার মাঠের অভাব আছে সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে অভাব দূর করতে হবে।

১৬। সংখ্যালঘুদের শিক্ষা

১৯৬১ সনে আগষ্ট মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে সংখ্যালঘুদের

শিক্ষা ও তাদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে যে সব সুপারিশ করা হয়েছে তা রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

১৭। শিক্ষা কাঠামো

সারাদেশের জন্য একই রকমের শিক্ষা কাঠামো থাকা সুবিধাজনক। ১০+২+৩ এই কাঠামো সারা দেশে গড়ে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি সুবিধামত স্কুল অথবা কলেজের সাথে যুক্ত হবে।

এই শিক্ষানীতি বাস্তবে রূপায়িত করতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। অর্থের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। যতশীঘ্র সম্ভব জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষা সংস্কার কাজটি সহজ নয় এ বিষয়ে ভারত সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। মানব সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষায় বিজ্ঞান গবেষণার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে কর্মসূচী রূপায়ণে যেখানে রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্র রাজ্যকে সক্রিয় সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবে।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকার কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজন হলে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ করবে।

৩১ জাতীয় শিক্ষা নীতি—১৯৮৬

১৯৮৫ সালে জানুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন হবে বলে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষা নীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত স্বরুপ পুস্তকারে *Challange of Education* নাম দিয়ে ১৯৮৫ খ্রীঃ দেশের শিক্ষার তৎকালীন চিত্র ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপের আভাষ দিয়ে সরকারী ইচ্ছার কথা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন। এই খসড়া নিয়ে দেশ ব্যাপী আলোচনা ও বির্তক হয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২১শে এপ্রিল ১৯৮৬ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় সরকার রচিত ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ এই খসড়া প্রস্তাব সমূহ আলোচনা করেন এবং এই খসড়া অনুমোদন করে এটিকে গ্রহণ করার সুপারিশ করে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে পাঠান। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ খসড়া বিল অনুমোদন করার পর ১৯৮৬ খ্রীঃ মে মাসে বিলটি সংসদের উভয় সভার অনুমোদন লাভ করে।

ভারত সরকারের ঘোষিত এই শিক্ষানীতি বারটি অংশে বিভক্ত। প্রথমে মুখবন্ধ বা ভূমিকা ও শেষে ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নীতি নির্ধারকরা নিজেরাই বলেছেন, ভবিষ্যৎ এতই জটিল যে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। প্রথম ও শেষ অংশ বাদ দিলে বাকী দশটি অধ্যায় বা অংশে নীতি রচয়িতারা ভবিষ্যৎ ভারতের শিক্ষার গতি প্রকৃতি নিয়ে পথ নির্দেশ করেছেন। যে সব বিষয়ে নীতি নির্ধারিকরা তাদের মতামত জ্ঞাপন ও সুপারিশ করেছেন তা হচ্ছে, শিক্ষার উপাদান ও ভূমিকা,জাতীয় ব্যবস্থায় শিক্ষা,সাম্যের জন্য শিক্ষা, বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পুনর্গঠন, কারিগরী ও পরিচালনা শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থাকে সক্রিয় করা, শিক্ষার বিষয় বস্তু ও শিক্ষা প্রক্রিয়াকে পুনর্বিন্যাস, শিক্ষক শিক্ষা পরিচালনা।

নীতি রচয়িতারা ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিকদের কি ভাবে গড়ে তুলতে চান তাদের সামনে কোন আদর্শ তুলে ধরে হবে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে কি ভাবে তাঁরা সে লক্ষ্যে পৌঁছাবেন এজন্য শিক্ষার্থীদের কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে, এই দশটি অধ্যায়ে তা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। দশটি অংশই প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ,কিন্তু যেগুলি ছাত্রদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে তাই বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে, বাকী অংশের সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।

দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে সুশিক্ষার সুযোগ পায় ও প্রতিটি শিক্ষক যাতে পড়াবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করেন একথা এই শিক্ষানীতিতে বার বার করে বলা হয়েছে।

১৯৬৮ খ্রীঃ গৃহীত শিক্ষানীতি দেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তারপর থেকে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।প্রতিটি শিক্ষাস্তরে মান উন্নয়ন, বিজ্ঞান সচেতনতা, নৈতিক মূল্যবোধ, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংহতি বোধ সৃষ্টি প্রভৃতি হয়েছে। গ্রামের ৯০ শতাংশ লোক বাড়ী থেকে ১ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে। দেশের সর্বত্র ১০+২+৩ যুক্ত শিক্ষা কাঠামো চালু হয়েছে। পাঠক্রমে বিজ্ঞান, অঙ্ক, কর্মে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক করা হয়েছে, শিক্ষার প্রত্যেক পর্যায়ে পাঠক্রমের পুনর্গঠন শুরু হয়েছে।

জাতীয় ব্যবস্থায় শিক্ষা

জাতি— ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রত্যেক নর নারী শিক্ষার সুযোগ পাবে, এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে সরকার। ১৯৬৮ সনে গৃহীত শিক্ষানীতি নির্দেশিত 'কমন স্কুল' প্রথা চালু করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ১০+২+৩ কাঠামো সর্বত্র চালু হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে কয়েক বছরের মধ্যেই তিন ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হবে নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা, ষষ্ঠশ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক ও নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষা হবে হাই স্কুলের শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনে পরিবর্তনযোগ্য কয়েকটি আবশ্যিক বিষয় নিয়ে একটি জাতীয় পাঠক্রম থাকবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সাংবিধানিক কর্তব্য, জাতীয় ভাবধারা বিকাশের সহায়ক বিষয় এর মধ্যে থাকবে। শিক্ষার্থীরা নতুন পাঠক্রমের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী পুরুষের সমান অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক অসাম্য দূরীকরণ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সৃষ্টি প্রভৃতি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হবার শিক্ষালাভ করবে। পাঠক্রমের মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষতার ও মূল্যবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বকে একটি পরিবার রূপে ধরে নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহবাস্থানের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। জন্মগত ও সামাজিক পরিবেশগত অসাম্য ও কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করাই নতুন শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য।

সাম্যের জন্য শিক্ষা

নতুন শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল অসাম্য দূর করা। যারা এতদিন বঞ্চিত হয়ে এসেছে তাদের সবাইকে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই অসাম্য দূর করতে হবে। নারীদের যে অবিচার সহ্য করতে হয়েছে তা থেকে তাদের সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসন দেবার জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। নতুন পাঠক্রম, পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষক শিক্ষণ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়ে মেয়েদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করা হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পথে যে বাধা আছে তা দূর করতে হবে। মেয়েরা যাতে বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষালাভ করতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।পেশাগত শিক্ষায় নারীপুরুষের ভেদাভেদ দূর করতে হবে, প্রচলিত ও অপ্রচলিত নতুন পেশার ক্ষেত্র মেয়েদের জন্য সম্প্রসারিত করা হবে।

তফসিলী জাতি ও উপজাতির শিক্ষা

নারীপুরুষ নির্বিশেষে গ্রামে শহরে সর্বত্র তফসিলী ও অ-তফসিলীদের মধ্যে শিক্ষার যে বৈষম্য আছে তা দূর করে সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত করতে হবে।

চর্মকার, হরিজন (যারা ময়লা পরিষ্কার করে) পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রথম শ্রেণী থেকে স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হবে। তফসিলীদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে।

বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র এমনভাবে স্থাপিত করা হবে যাতে তফসিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তফসিলী ছাত্রছাত্রীদের জন্য জেলা সদরে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তফসিলী উপজাতি

আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্কুল খুলতে হবে। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য উপজাতি কল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

উপজাতিদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। কথ্য ভাষাও অনেক জায়গায় পৃথক। উপজাতিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে পাঠক্রম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা হবে। উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত খুজে পাওয়া গেলে তাদের আদিবাসী অঞ্চলে শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহী করা হবে।

আশ্রম বিদ্যালয় সহ অধিক সংখ্যক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

উপজাতিদের জীবনধারার সাথে সংগতি রেখে বৃত্তিশিক্ষায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। উপজাতি এলাকায় বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। আদিবাসীদের শিক্ষার সর্বস্তরে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বাভাবিক সৃষ্টিমুখী সম্ভাবনা বিকাশের সহায়ক পাঠক্রম রচিত হবে।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সম্ভব হলে সাধারণ ছেলেদের সাথে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। জেলার সদরে প্রতিবন্ধীদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরী করা হবে। স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে উৎসাহী করা হবে।

বয়স্ক শিক্ষা

শিক্ষায় জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে ১৪ থেকে ৩৪ বছরের বয়স্কদের নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প সমগ্র জাতিকে গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের সহযোগী সংস্থাকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সবাইকে এই প্রচেষ্টার সাথে জড়িত হয়ে সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ বলতে শুধু নাম সই করা মনে করলে চলবে না, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন, শিক্ষার্থীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উন্নয়ন এর সাথে ভাবতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষার সাথে নানা পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। (১) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, (২) কর্মে নিয়োগকারী সংস্থা দ্বারা তাদের কর্মীদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, (৩) মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, (৪) পুস্তক প্রকাশনা, পাঠাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপন, (৫) রেডিও, দূরদর্শন ও সিনেমা প্রভৃতি গণ মাধ্যমগুলির ব্যাপক ব্যবহার। (৬) বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পুনর্গঠন

প্রাথমিক শিক্ষা

এই স্তরের শিক্ষায় দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে ও পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পড়া ছাড়বে না। শিক্ষার মান উন্নয়ন, পরীক্ষায় সফল হতে না পারায় অনুন্নয়ন ব্যবস্থা একেবারে বাতিল করার সাথে দৈহিক শাস্তিকে বিদ্যালয় থেকে দূর করতে হবে।

প্রতি বিদ্যালয়ে সব ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী দু'খানা বড় কক্ষ, প্রতি বিদ্যালয়ে দুজন শিক্ষক, তাদের মধ্যে একজন নারী ও একজন পুরুষ। ধীরে ধীরে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া থাকবে ব্লাক বোর্ড, ভূগোল শিক্ষার জন্য চার্ট,

রাজ্য ও জেলার মানচিত্র, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সাজ সরঞ্জাম, খেলার জন্য ফুটবল, ভলিবল, রবারের বল। এছাড়া চক, ডাস্টার ঘন্টা ইত্যাদি।

বিধিমুক্ত শিক্ষা

যে সব ছেলেমেয়েরা ১৪ বছরের আগে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, যেখানে বিদ্যালয় নেই বা যে সব ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই কার্যে নিয়োজিত হয়েছে তাদের জন্য বিধিমুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিধিমুক্ত শিক্ষার পাঠক্রম জাতীয় পাঠক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রচিত হবে। প্রথামুক্ত শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার জন্য খেলাধুলা ও অন্যান্য আনন্দদায়ী কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। প্রথামুক্ত শিক্ষাপরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে পঞ্চায়েত বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হাতে। বিদ্যালয়ত্যাগী ছাত্রদের উপর নতুন শিক্ষানীতিতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। দেখতে হবে ১৯৯০ সনে যাদের বয়স ১১ বছর তারা পাঁচ বছরের শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ করেছে এবং ১৯৯৫ সনে ১৪ বছরের সব ছেলেমেয়ে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এসে গেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয় হবে—বিজ্ঞান, মানবিক বিষয় ও সমাজবিজ্ঞানের নানা দিকের সাথে। এই স্তরেই ঐতিহাসিক চেতনা, জাতীয় প্রেক্ষাপট, সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় শিক্ষার্থী। এই স্তরে অত্যন্ত বিবেচনা করে রচিত পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে মানবিক বিষয়সমূহ তাকে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। এই স্তরের শিক্ষা বৃত্তিমুখী করে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের উৎস হয়ে দাঁড়াবে।

নবোদয় বিদ্যালয়

অত্যন্ত প্রতিভাবান শিক্ষার্থী উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা পেলে তার উন্নতি অতি দ্রুত হয়। এইসব প্রতিভাবান শিশুদের জন্য খরচের কথা না ভেবে উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে সারা দেশে নির্দিষ্ট ধাঁচের আদর্শ বা নবোদয় স্কুল স্থাপন করা হবে। জাতীয় সংহতির আদর্শকে সামনে রেখে তার সাথে ন্যায়বিচার ও সমতাকে যুক্ত করে এই নবোদয় বিদ্যালয় গঠিত হবে। এইসব বিদ্যালয়ে তফসিলী ও আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য ছেলেরা একসাথে পড়াশুনা করবে, এতে জাতীয় সংহতি শক্তিশালী হবে। যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে। নবোদয় বিদ্যালয় হবে আবাসিক ও অবৈতনিক।

১৯৮৬ সনের শিক্ষানীতির সাথে সংগতি রেখে পশ্চিমবঙ্গ বাদে কয়েকটি রাজ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে নবোদয় বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করা হবে। প্রতি ব্লকে এই পরীক্ষা হবে। শহরের ছেলেমেয়েদের শকতরা কুড়িজনের বেশী নবোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে না। মেয়েদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। অনুন্নত জাতি উপজাতির ছেলেমেয়েদের জন্যও আসন সংরক্ষিত থাকবে। যে জেলায় যে হারে অনুন্নত জাতি ও উপজাতি আছে সে জেলায় সেই হারে আসন থাকবে। বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে যাবার খরচ ও অন্যান্য খরচ সরকার থেকে দেওয়া হবে। এছাড়া বেশভূষা, খাওয়া, বইপত্র ইত্যাদির জন্য যে খরচ সব কিছুই সরকার থেকে দেওয়া হবে।

এই বিদ্যালয়গুলিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। নবোদয় বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হবে। VII বা VIII পর্যন্ত মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় পড়ান হবে। VIII অথবা IX থেকে হিন্দী বা ইংরেজী হবে শিক্ষার মাধ্যম।

প্রত্যেককে তিনটি ভাষা শিখতে হবে। যথা মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী। VIII অথবা IX থেকে প্রতি বিদ্যালয় থেকে শতকরা ২০/৩০ জন ছাত্রকে অন্য ভাষাভাষী রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। যদি বাংলা থেকে কোন ছেলেকে হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেই ছেলেকে হিন্দী, ইংরাজি, বাংলা পড়তে হবে। হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে যে সব ছাত্রকে বাংলায় আনা হবে তাদের বাংলা ভাষা পড়তে হবে।

নবোদয় বিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি শ্রেণীতে দু'টি বিভাগ (Section) থাকবে। প্রতিটি বিভাগে চল্লিশজনের বেশী ছাত্র থাকবে না। পড়বার জন্য সব আধুনিক সাজ সরঞ্জাম থাকবে। পড়ানোতে T.V., রেডিও, টেপরেকর্ডার, মাইক্রোকম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হবে।

স্কুলগুলি কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরিচালনাধীন থাকবে। এজন্য একটি নতুন বোর্ড স্থাপনের কথা হচ্ছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষাপদ্ধতিতে বক্তৃতা দেবার পদ্ধতিকে কমিয়ে আলোচনার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে।

শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করা

নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিশিক্ষার কার্যসূচীকে সুপরিকল্পনার সাথে রূপায়িত করা হবে। বৃত্তিশিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবিকার নতুন পথ খুলে দেওয়া হবে। বৃত্তিশিক্ষাকে কার্যকরী করে তুলতে শিল্প শিক্ষণকেন্দ্রগুলির সাথে এদের যুক্ত করা যেতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বৃত্তিমুখী শিক্ষার জন্য কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান থাকবে। সমাজে যারা অবহেলিত, বঞ্চিত পুরুষ বা নারী উপজাতি তাদের বৃত্তিশিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিশিক্ষার কর্মসূচী নেওয়া হবে।

প্রস্তাব করা হয়েছে ১৯৯০ সনের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শতকরা ১০ জনকে ও ১৯৯৫ সনের মধ্যে শতকরা ২৫ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে নিয়ে আসা হবে। বৃত্তিশিক্ষাকে উৎসাহিত করতে সরকার কর্মদান নীতির পুনর্বিবেচনা করবে।

উচ্চশিক্ষা

সারা দেশে ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫০০০টি কলেজ আছে। নতুন কলেজ না খুলে, যা আছে সেই কলেজগুলিতে সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষামানের অবনতি রোধ করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশে বেশী সংখ্যায় স্ব-শাসিত কলেজ স্থাপনের উদ্যোগী হতে হবে।

বিশেষীকরণের শিক্ষাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হবে। উচ্চশিক্ষায় নতুন নতুন গবেষণা ও ভাষাগত দক্ষতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ভারততত্ত্ব ও নানা মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় তার উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে। উৎসাহিত করা হবে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাকে গণতন্ত্রী করণের জন্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৮৫ সনে এই উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের সার্বিক প্রযত্ন করতে হবে।

চাকুরী ডিগ্রীতে বিচ্ছেদ

ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন চিকিৎসা ইত্যাদির মত বিষয় ছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রে ডিগ্রী অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে না। চাকুরীদাতা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজেরাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করে উপযুক্ত প্রার্থী বেছে নেবে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়

গান্ধীজীর চিন্তাধারা অনুসরণে গ্রামাঞ্চলে বিরাট পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নতুন ধরনের গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

ভাষা

ভাষার ক্ষেত্রে ১৯৬৮ সনের নীতিকে সমর্থন জানিয়ে বলা হয়েছে নীতি রূপায়ণ অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেই নীতিকেই উৎসাহের সাথে রূপায়িত করা হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞান শিক্ষাকে এমনভাবে সংগঠিত করা হবে যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্র দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্য পাঠ্য হবে। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, এই যন্ত্রের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে কোন বিষয়ের কার্যকারণের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দৈহিক শিক্ষা ও খেলাধূলা

মানসিক বিকাশের সাথে দৈহিক বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষার সার্থকতা দৈহিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। দৈহিক শিক্ষা ও খেলাধূলার জন্য সারা দেশব্যাপী একটা বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

দৈহিক শিক্ষা ও খেলাধূলার জন্য খেলার মাঠ, সাজ সরঞ্জাম, দৈহিক শিক্ষার শিক্ষক, কোচ ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের খোলা জায়গা খেলার জন্য সংরক্ষিত করা হবে। খেলার জন্য ক্রীড়াকেন্দ্র ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠা হবে। এখানে সাধারণ শিক্ষার সাথে ক্রীড়া শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। খেলাধূলায় যারা বিশেষ দক্ষ তাদের এইসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হবে। যোগব্যায়ামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে যোগব্যায়ামকে স্থান দেওয়া হবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর অগ্রগতি বিচারে মূল্যায়ন একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষার মান উন্নয়নেও মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন। পরীক্ষা হবে নির্ভরযোগ্য, যথার্থ। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুধু ছাত্রের কৃতিত্বের পরিমাপ হবে না, শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া উন্নয়নের সহায়ক হবে।

(১) পরীক্ষায় অদৃষ্ট নির্ভরতা থাকবে না, হবে নৈর্ব্যক্তিক;
(২) মুখস্থ দূর করতে হবে;
(৩) পরীক্ষায় পুঁথিগত জ্ঞান ও বাইরে অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন হবে;
(৪) পরীক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা হবে;
(৫) মাধ্যমিক স্তর থেকে সেমিস্টার প্রথা চালু হবে;

(৬) নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা চালু করা হবে ;

(৭) পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের সাথে শিক্ষার সাজ সরঞ্জাম ও শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে।

বহিঃপরীক্ষার প্রাধান্য কমিয়ে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষক

শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা সর্বাধিক। একটা সমাজ শিক্ষককে কতটা মর্যাদা দিল তার মধ্য দিয়েই বিচার হবে সেই সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধের। শিক্ষার সার্বিক পুনর্গঠন নির্ভর করে শিক্ষকদের মানের উপর। কোন বিষয় নিজে বোঝা, তা নিয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করা এবং ছাত্রদের বোঝানোর ক্ষমতা শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হওয়া দরকার। শিক্ষকদের মনে এই দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলবার জন্য সরকার ও সমাজকে উদ্যোগী হতে হবে। শিক্ষকদের নিয়োগ পদ্ধতি ঢেলে সাজাতে হবে। বেতন ও চাকুরীর শর্ত শিক্ষকদের সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্বের দিকে নজর রেখে এমন হবে যাতে দেশের প্রতিভাবান তরুণেরা এই পেশা গ্রহণে উৎসাহিত হয়। সারাদেশে একই রকম বেতনের হার, চাকুরীর শর্ত ও অভাব মিটাবার ব্যবস্থা রাখা হবে। শিক্ষকদের জাতীয় সংগঠনগুলি সরকারের সহযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষকদের জন্য একটি আচরণ বিধি তৈরী করবে। নতুন শিক্ষানীতিতে সর্বভারতীয় শিক্ষা সার্ভিস স্থাপিত হবে।

আর্থিক সংস্থান

একটা উন্নতিশীল দেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তব রূপায়ণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) ও জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮) তে একথাই বলা হয়েছে। শিক্ষায় কিছু বরাদ্দ না করা বা সামান্য অর্থ বরাদ্দ করার পরিণতি মারাত্মক ক্ষতিকর। বৃত্তিশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, উচ্চ গবেষণার যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে সেগুলিকে আধুনিক করে তুলতে হবে। ১৯৬৮ সনের শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হয়নি। ধীরে ধীরে শিক্ষার জন্য অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে শিক্ষার লক্ষ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য অর্থের বরাদ্দ যাতে ছয় শতাংশ ছাড়িয়ে যায় তা দেখতে হবে।

পর্যালোচনা

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষানীতি কতটা কার্যকর করা হল তা খতিয়ে দেখতে হবে। নতুন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বা পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, শিক্ষানীতি রূপায়ণের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

ভবিষ্যৎ

ভারতের শিক্ষার জটিল ভবিষ্যৎ অনুধাবন করে সুস্পষ্ট কিছু বলা কঠিন, তবু আমাদের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে অথবা আমাদের লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হব। আগামী শতকের জন্য ভবিষ্যৎ ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্য একটা মজবুত শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য, সেইভাবে আমাদের প্রচেষ্টা চলবে।